দৈনিক আমাদের সময়

তারিখ 26 JUL 2016 পৃষ্ঠা ৬ কলাম

শহীদ ইকবাল

সুশিক্ষা ও পারিবারিক বন্ধন তৈরির সংগ্রাম

আমরা যারা এ ভূগোলের বাসিন্দা– তারা 'মায়াবী'। 'মায়াবী' কথাটা ধার করেছি কীটস থেকে। তার সময়ে 'Magic casement'– বিশ্ব ও মানবের সম্পর্কের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি এমনটা বলছিলেন। যা হোক, আমাদের এ দেশের উত্তরে আছে হিমালয়, দক্ষিণে সমুদ্র; এটা মৌসুমি বায়ুর দেশ। বৃষ্টিপাতের দেশ। নাতিশীতোষ্ণ তার আবহাওয়া। ষড়ঋতুতে এখানে ফুল ফোটে, বায়ু পরিবর্তন হয়, বিচিত্র বর্ণের-ধর্মের-আচারের মানুষ এখানে নানাভাবে, নানা চিন্তায় বসত করে। কেউ কাউকে আঘাত দেয় না। ধর্ম অনেক, কিন্তু দেশ সবার। এই তো চল হয়ে আসছে কতকাল! কেউ কারো দখলি নেয় না। কত ভাষা, কত সংস্কৃতি এ দেশে– সে জন্যই বাউল-পীর-মুর্শিদ-দরবেশ-ফকির এ দেশে এসেছেন অনেককাল। তাদের অধ্যাত্মদৃষ্টি সৃষ্টিতে তুলে ধরেছে অপার ঐশ্বর্য। লালন-হাসন-আবদুল করিম বা বিজয় সরকার সবার হয়ে গান বেঁধেছেন। তাতে ধর্মচর্চায় ছেদ পড়েনি। বাধাও হয়নি। তার ভেতর দিয়েই একাত্তরে মুক্তির ঐক্য গড়ে উঠেছিল। ভাষার ঐক্য, বিভিন্ন জাতির ঐক্য, সব শ্রেণির মানুষের ঐক্য অন্তর্লীন। এ ঐক্যের লক্ষ্য ছিল মুক্তি। স্বাধীন ভূখণ্ডে মুক্তি। সর্বধর্মের মানুষই এ ঐক্যের প্রশ্নে অভ্রান্ত লক্ষ্যে পৌঁছেও যায়। আগে কী এমনটা ছিল? ছিল না, কারণ সর্বদা ক্ষাত্রশক্তির দ্বারা আমরা শোষিত হয়েছি। এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিরোধ করেছি। প্রতিরোধীশক্তি বিপক্ষে দাঁড়িয়েছে। তারপর সফলতা এসেছে। ঐক্য হয়েছে, পরাজিত হয়েছে প্রতিরোধীশক্তি। রাষ্ট্র ও সংবিধানে তখন তার দায়িত্বও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ফলে আইনের শাসন, বিচারের স্বাধীনতা সবটুকু একটি রাষ্ট্রে নির্ধারিত হয়। লাল-সবুজের পতাকায় মানবমুক্তির স্বপ্ন গড়ে ওঠে। বাঙালিত্ব নিয়ে বা ধর্ম নিয়ে তো কোনো প্রশ্ন নেই। কেউ প্রশ্নও তোলেনি। প্রয়োজনও পড়েনি। অনেকেরই মনে আছে, হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-ক্রিশ্চিয়ান-সাঁওতাল-মগ-চাকমা পাশাপাশি সবাই ছিল, স্বভাবমতো। কেউ কারো ওপর হামলে পড়েনি, আক্রান্তও হয়নি। পারস্পরিক সহাবস্থান কিংবা খাওয়া-থাকা-গুজব করা কোনোটাতেই কারো সমস্যা হয়নি। বিশ্বাসটাই ছিল ওরকম। প্রাত্যহিক আচার-আনুষ্ঠানিকতা, প্রতিবেশীসুলভ সম্পর্ক সে বিশ্বাসের ভেতরেই প্রতিষ্ঠা ছিল। কিন্তু এখন কী দেখা যায়? মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ তো ক্রমেই ফ্যাকাসে হয়ে পড়েছে। পরস্পরের বিরুদ্ধে অভাব-অভিযোগ অনেক। এই ভূখণ্ডকে স্বাধীনভাবে পেয়ে, আমাদের ঐক্য অভেদ হয়নি। চল্লিশ বছরের যে ইতিহাস তাতে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়েছি, আলাদা হয়েছি– যুক্তি-তর্কে-প্রশ্নে-জিজ্ঞাসায়-আস্থায়-অনাস্থায় ক্রমেই বিভেদ তৈরি করেছি। আর সেই পৃথক হওয়ার সুযোগে অপশক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে তীব্রভাবে– সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সভ্যতা, সংস্কৃতি তো আর স্থির কিছু নয়। তা চলমান ও পরিবর্তনশীল। গত কয়েক দশকে তার গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে। ওপরকাঠামো ও ভেতরকাঠামোতেও রূপান্তর হয়েছে। সে রূপান্তরের পথ ধরে এই পৃথিবী হয়ে উঠেছে টেনিসনকথিত 'নিষ্ঠুর রক্তলাঞ্ছিত দন্তনখরময়'।

তাই তো আমাদের জীবনে বিপর্যস্ততা, অপমান এত বেশি। চলাফেরায় বাধা অনেক। মুক্তির পর্যায়গুলো বাধাপ্রাপ্ত। বিপরীতে ধর্মের নামে ব্যক্তি-জাতি-সমাজ-গোষ্ঠী-সংঘ আলাদা। পরিবারে পরিবারে ভেদ। একে অন্যকে, চেনায়-বলায় কিংবা পরিচয়ে পার্থক্য করে। বন্ধুত্বে দোটানা, অপচয়। সুবিধার আশ্রয়ে সবটুকু গড়া। পরিবারও তাই। প্রযুক্তির অভিশাপ বুঝি পরিব্যাপ্ত। ফলে সহজপাচ্য ধর্মের নামে জিঘাংসা বাড়ে। তাই অনেক ক্ষেত্রে পরাস্ত হয় মানবতা। ছাত্র শিক্ষককে নৃশংসভাবে খুন করে। প্রতিবেশীকে চেনা যায় না। রক্ষণশীলতার বেড়াজালে অসাম্য বঞ্চিত করে সবাইকে। দরিদ্র সৃষ্টি হয়েছে। দারিদ্র্যের সুযোগে ধর্মব্যবসা বেড়েছে। ক্রমাগত গরিব শ্রেণিই নয়, ধনীরাও সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে। অবসাদ, ক্লান্তি, প্রাচুর্য, অর্থের অনর্থ, অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা উন্নাসিক প্রজন্ম গড়িয়ে ফেলে। শেকড়-অস্তিত্ব অচেনা হয়ে যায়। নিজ ভাষার চেয়ে পরভাষা হয় আপন। হিন্দি, ইংরেজি, ফরাসি, স্পেনিশ শিখে বাংলা-বাঙালিপনা ভুলে যায়। সংস্রব নেই। কারণ ওই অসাম্যের তারে সবকিছু বাঁধা। উঁচুস্তরের শ্রেণি তৈরি হয়েছে, সেখানে নীচু পরাস্ত, অপরিচিত। মধ্যিখানে মধ্যশ্রেণি অনিকেতপরায়ণ, দোদুল্যমান। এই সুযোগে ধর্মান্ধ মওকা বৃদ্ধি। মনে আছে, আশি-নব্বইয়ের দশক থেকে যে ধর্মীয় ইউটোপিয়া

সাম্রাজ্যবাদের বিপরীতে তৈরি হয় তার প্রথম আঘাত মার্কিনিরাই অবলোকন করে ওয়ান-ইলেভেনে। গ্রেট ম্যাসাকার। সেটি আর কোনো অঞ্চলে কিন্তু থেমে থাকেনি। এমনকি লাদেন হত্যার নামে এই উপমহাদেশে যা হয়েছে– তাও ভয়ঙ্কর। কার্যত এই ভয়ঙ্করের ভেতর দিয়েই সন্ত্রাসের নবরূপ সৃষ্টি।

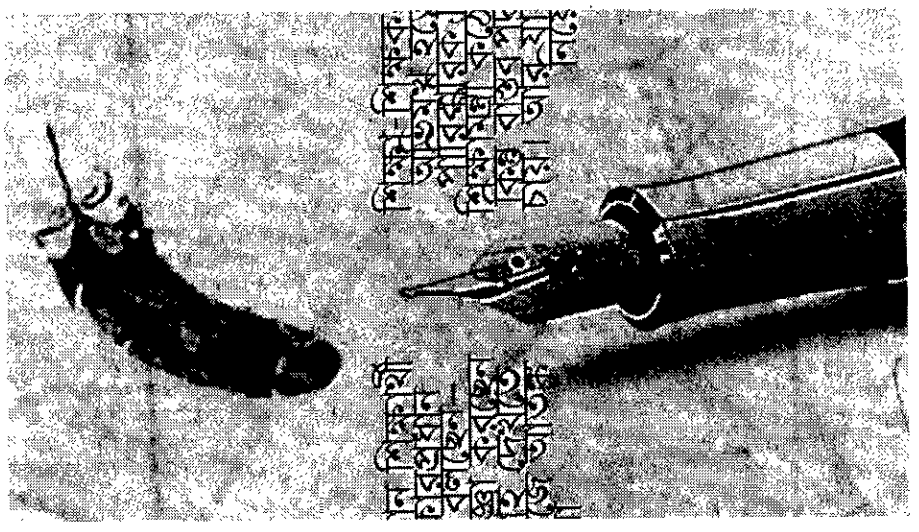

এখন বাংলাদেশের মানুষ তো ধর্মান্ধ নয়; ধর্মপ্রিয়, ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল। একাধারে তারা অনেকাংশে দরিদ্রও। বিদ্যা, পড়াশোনা, সংস্কৃতিচর্চা, মুক্তচিন্তার চর্চা করা (ধর্মচর্চা ছাড়া) সবই বলা চলে প্রথম প্রজন্ম ধরে চলছে। আধুনিকতার চর্চাও করছে ওই প্রথম প্রজন্মই। সেখানে সংস্কার, কুসংস্কার, মূল্যবোধের প্রথা ভাঙা এবং উৎকর্ষ সাধনের জায়গাটি যে খুব শক্ত তাও বলা যায় না। ফলে আবেগের বশে কেউ অধিক বিপ্লবী হয়ে যেতে পারে, কেউ বা জঙ্গি (নিবরাস ও তার বন্ধুদের মতো) হতেও আটকায় না। সাধারণত এই সমাজস্তরের ধনীর ছেলেদের ইহজীবনের চাওয়া-পাওয়া ও প্রাচুর্যের অধঃক্ষেপ যখন শেষ হয়ে যায় তখন তাদের শান্তির জায়গা আর কী থাকে! কীভাবে বা কোথায় তারা শান্তি খুঁজবে? তখন কোনো শিক্ষকের প্ররোচনায় কিংবা স্বর্গীয় সুধা লাভের আকাঙ্ক্ষায় দ্রুত সহজপথে ঝুঁকে পড়ে। এ জন্য খুব বেশি শ্রম ব্যয়ের তো প্রয়োজন পড়ে না। প্রাচুর্য থেকেই অনর্থ আসে। সেখানে ধর্মের আফিম এটি পরিবার বা তাদের নির্ধারিত সমাজে– সে কাজে তেমন বাধা দেয় না। কারণ কী? যে সন্তান মাসের পর মাস নিখোঁজ কোনো পরিবার (শুধু জিডি করা ছাড়া, জিডি করা নিয়েও প্রশ্ন আছে) তার জন্য তেমন কিছু করছে না। বস্তুত তারা জানে, সন্তান ধর্মের কাজে আছে। ধনাঢ্য পরিবারগুলো ধর্মচর্চা আর ধর্মান্ধতা গুলিয়ে ফেলে। কারণ যেভাবে এই স্বাধীন দেশে তারা অর্থ-সম্পদের মালিক হয়েছে, সেখানে তাদের কাছে ওটা তো সহজলভ্যই বলা যায়। শ্রম-ঘাম, অধ্যবসায় তেমন খরচ হয় না। ফলে ধর্মের আচরণ আর জঙ্গি কমিটমেন্ট তাদের কাছে তেমন পার্থক্য হয় না।

২

এই বাংলাদেশকে, তার স্বীয় ঐতিহ্যকে, স্বতন্ত্র পরিচয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে মানবিক সম্পর্ক জরুরি। যোগসূত্র তৈরি করতে হবে। পরস্পরের মধ্যে খুলে দিতে হবে কীটসকথিত মায়াবী জানালা। এর বিকল্প কী? 'নতুন প্যারাডাইম' সৃজন করা! আমরা অনেকবার বলেছি, জঙ্গি হামলা বিচ্ছিন্ন। আগে এখানে-ওখানে বিদেশি বা পুরোহিত, মুসলিম খুন হলেও আমলে নিইনি। এই ধনী সন্তানদের যে পরিণতি তার কারণ খুঁজিনি। ইংরেজ স্কুলে পড়ে যে সাংস্কৃতিক অবরুদ্ধতার ফেনায়িত ঢেউ তাদের গ্রাস করেছে আর তা যে জাতি-সংস্কৃতিবিরোধী তা আমলে নিইনি। অস্পষ্টতাকে প্রশ্রয় দিয়েছি। এখন এসব প্রমাণিত সত্য। শুধু মাদ্রাসার সন্তানরা বা গরিবরা নয়, পাশাপাশি ধনীরাও এর সঙ্গে যুক্ত। এটি একটি সমাজ-অর্থনীতির তত্ত্বও মনে হয়। যার অনেক আছে, অনেকের ভোগসামগ্রী যখন সীমাহীন তখন সে ধর্মকেই আঁকড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। কারণ তাতে যুক্তির চেয়ে ভক্তি গুরুত্ব পায়। সরল আবেগে নিঃশঙ্ক কমিটমেন্ট তৈরি করে। এখন যে মীমাংসাহীন রহস্যময় অদৃশ্য পারলৌকিক জীবন সেখানে মীমাংসা বা আশ্রয়ের পরিণতি কী? আবার ঠিক বিপরীতে যে দরিদ্র, যার কিছুই নেই– সেও সহজভাবে নিয়তির বিশ্বাসের কাছে নিজেকে সর্বস্বত্ব ভেবে সমর্পণ করছে। তার মধ্যেই শান্তি খুঁজে পাচ্ছে। সম্পদ-প্রাপ্যতার বিচারে যে এক্সট্রিম অবস্থা সেখানে ধর্ম কী ইক্যুয়াল নয়! এ জন্যই এই উঠতি নতুন প্রজন্মের মাঝে অন্ধতার এ রূপ আমরা লক্ষ করছি। সেখানে পারিবারিক শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা কোনোটাই তেমন গুরুত্ব পাচ্ছে না। চিন্তা ও যুক্তির বিবেচনা সেখানে পরাস্ত। বিপরীতে আবেগ আর ভক্তির কমিটমেন্টই সত্য। সত্যিকার অর্থে, এরা বাংলাদেশের জন্ম-ইতিহাসটাও তো সঠিক জানে না। সে শিক্ষা পায়ওনি। এর ফলে সঠিক সাংস্কৃতিক প্রবাহটি ধরতে পারছে না। ভোগবাদ আর প্রযুক্তির ঝলসানিতে বিছিন্ন হতে হতে তারা সহনশীলতার সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলেছে। পরাস্ত হয়েছে যৌক্তিক জীবনের কাছে। এই উদাসীনতায় ম্যাথু আর্নল্ডের 'ডেভার বিচ' কবিতার কথা ভাবি : 'অপস্রিয়মাণ স্রোতের পেছনে ধাবমান/ প্রিয়তমা এই প্রতারক উদাসীন বিশ্বে/ কোনো ভালবাসা নেই, শান্তি নেই/ নেই বেদনায় কোনো সান্ত্বনা।'

এখন এই উদাসীনতার পরিণতি একটু ভিন্নরকম হলেও তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এখানে মেধার যৌক্তিক বা সুচারু প্রসার ঘটেনি। তখন তো প্রশ্ন আসে কীভাবে প্রকৃত সত্যে ফেরানো যাবে? কীভাবে আমাদের চৌকস প্রজন্মের জন্য মায়াবী জানালা খুলে দেওয়া সম্ভব? পরিবার-সমাজ এ ক্ষেত্রে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারে? সরকার-রাষ্ট্র কতটুকু আইন, শাসন, বিচারব্যবস্থা দিয়ে সত্যিকারের সংস্কৃতিকে ফিরিয়ে দিতে পারে? ধর্মবিরোধিতা নয়, ধর্মান্ধতা নয়, জঙ্গি নয়, প্রগতিশীল আধুনিক উন্নয়নশীল সত্যিকার বাংলাদেশ তো আমাদের প্রয়োজন। এটা কীভাবে সম্ভব? পারিবারিক শিক্ষার পাশাপাশি শিক্ষাঙ্গনে নৈতিক শিক্ষার দিকে জোর দেওয়াটা তো খুব জরুরি। এখন তো তারই প্রচার চলছে সর্বত্র। সর্বোচ্চ মহল থেকে শুরু করে কমিটি-কনভেশন করা কিনা চলছে। কিন্তু যা হোক, আমরা তার ফল প্রত্যাশা করি। এখন সময় নেই!

প্রসঙ্গত, স্কুল-কলেজের পাঠ ও পাঠদানের নির্ভেজাল মনিটরিং চাই। তৃণমূল পর্যায়ে অনেক স্কুল আছে কিন্তু লেখাপড়ার অবস্থা ভালো নয়। থানা ও জেলা শিক্ষা-কর্মকর্তারা অনেক ক্ষেত্রেই সঠিক দায়িত্ব পালন করছেন না। দুর্নীতির রাহুগ্রাস তো সর্বত্র– তার কী হবে! রাষ্ট্রের দুর্নীতি রোধ করে হবে। দুদক শক্তিশালী হবে তো! নাকি নখদন্তহীন থাকবে। আসলে 'কান টানলে মাথা আসা'র মতো সব ব্যাপার। শুধু মোটিভেশনে কাজ হবে না। বিদ্যাচর্চায় মানবিক মূল্যবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমকে গতিশীল করতে হবে। মুখস্থ বিদ্যা– হোক তা ইংরেজি বা বাংলা কোনো কাজেই আসবে না। প্রশ্নশীল, যুক্তিশীল প্রজন্মের কোনো বিকল্প নেই। অন্যান্য বিভাগের কথা বাদ দিই, শিক্ষা বিভাগে দুর্নীতি দূর করতে হবে। এটা রোধ করে জবাবদিহিতা কায়েম করতে হবে। প্রতিষ্ঠান তো অনেক, সরকার অর্থ দিচ্ছে কিন্তু কাজ হচ্ছে না। শিক্ষকতা তো ব্রত। সেটি কেউ ভাবে না। এ বিভাগে প্রশাসনিক, একাডেমিক দুর্নীতি বেশুমার পর্যায়ের। পাশাপাশি সরকারের সর্বদলীয় উদ্যোগ, স্থানীয় থেকে বিভিন্ন পর্যায় পর্যন্ত প্রশাসনিক মোটিভেশন জরুরি। আর আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে নিরপেক্ষ থেকে কাজ করতে হবে। আরও যুগোপযোগী করে তুলতে হবে। এসব কঠিন প্রতিজ্ঞা ছাড়া সহজ নয়। সর্বস্তরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজটা করতে হবে। রাষ্ট্রকে কাজকর্মে সক্রিয় করে তুলতে হবে। সেখানে দুর্নীতি তাড়িয়ে জবাবদিহিতা ও আইনের শাসনের সংস্কৃতি জরুরি। শিক্ষা-শিক্ষক-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থী অভিমুখ হতে হবে। সরকারপ্রধান পারিবারিক শিক্ষার কথা বলছেন– শিক্ষামন্ত্রী কঠোরতার প্রতিজ্ঞা করছেন কিন্তু বাস্তব পদক্ষেপটা সবাই দেখতে চায়। আর যাই হোক সমাজে আতঙ্ক নিয়ে চলা যায় না।

লেখক : অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়